বিজয়কৃষ্ণ



আশুতোষ লাইব্রেরী
ঢাকা ও কলিকাতা

তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা

তৃতীয়

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ



শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।



প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স,
আশুতোষ লাইব্রেরী
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩২৯

প্রথম সহস্র)



ঢাকা, আশুতোষ প্রেসে
শ্রীরেবতীমোহন দাসদ্বারা মুদ্রিত

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ



(১)

চারি শত বৎসর আগের কথা,—নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল,—তখন ভক্তি ও প্রেমের মধুর বন্যায় সত্য সত্যই শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে গিয়াছিল। সে সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের মধ্যে শান্তিপুরের শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ছিলেন একজন প্রধান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অদ্বৈত প্রভুর বংশে বর্ত্তমান যুগে শ্রীমৎ আনন্দকিশোর গোস্বামীর জন্ম হয়। বিজয়কৃষ্ণ এই আনন্দ-কিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র।

পৃথিবীতে দেখা যায় যে—ধর্ম্মজগতে কিংবা কর্ম্মজগতে যে সকল মহাপুরুষ অলৌকিক কীর্ত্তিমান হইয়া গিয়াছেন,

তাঁহাদের সকলের পিতামাতাই অসাধারণ গুণবিশিষ্ট ছিলেন। গোস্বামীপ্রভুর পিতামাতার পক্ষেও একথা প্রযোজ্য।

আনন্দকিশোর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ধর্ম্মের এইরূপ পতন দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। কেমন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন হইবে, কিসে জীবের দুঃখ দূর হইবে, এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। এজন্য তিনি কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণে আপনার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইতেন।

আনন্দকিশোর একজন ত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন। শিষ্য সেবকের নিকট এক পয়সাও যাচ্ঞা করিতেন না। ইচ্ছা করিয়া যে যাহা প্রদান করিত, তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় করিতেন না। দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি যে কেহ তাঁহার কাছে প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইত, অমনি তাহাকে যথাসাধ্য দান করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে কেহ কখনও বিমুখ হইয়া যাইত না। নিরাশ্রয় দরিদ্র শিষ্যদিগকেও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। সেবা বিষয়ে তিনি এতদূর নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে, ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করিবার কাষ্ঠাদি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে "লাকড়ী ধোয়া" গোঁসাই বলিত।

ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণের এমন ব্যাকুলতা ছিল যে, তিনি একবার তাঁহার নিত্যপূজার শালগ্রাম শিলা গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক পদব্রজে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে যাত্রা করিলেন, এবং শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে প্রায় এক বৎসরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এইরূপ ভয়ানক ক্লেশ করিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনলাভে অপার আনন্দ লাভ করেন। এ সময়ে একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, জগন্নাথ দেব তাঁহাকে বলিতেছেন—"তুই বাড়ী যা, আমরা দুইজনে তোর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব, এবং তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই বর লাভ করিয়াই আনন্দকিশোর শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে দুইবার বিপত্নীক হন। পত্নীদ্বয়ের কোন সন্তানাদি হয় নাই। অতঃপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুলা গ্রামনিবাসী পরম ভাগবত ৺গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় দুইটী পুত্রসন্তান লাভ করেন। প্রথমটীর নাম ব্রজগোপাল এবং দ্বিতীয়টির নাম বিজয়কৃষ্ণ।

বিজয়কৃষ্ণের জননী স্বর্ণময়ী দেবী, অতি গুণবতী এবং

দয়াবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার দয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার নিকট কেহ কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন করিলে, সর্ব্বস্ব দান করিয়া সে অভাব মোচন করিতে হইলেও তিনি তাহা করিতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, রোগীকে ঔষধ পথ্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান—তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে ছিল। প্রত্যহ চারি পাঁচজনের উপযুক্ত অতিরিক্ত অন্নব্যঞ্জন রন্ধনপূর্ব্বক গরীব দুঃখীকে অনুসন্ধান করিয়া আহার করাইতেন, পরে নিজে আহার করিতেন। তিনি বলিতেন—"যে একাকী আপনার জন্য রান্না করে, সেত শেয়াল কুকুরের মত। পাঁচ জনের কম কিছুতেই রান্না করা উচিত নয়।" কৃপণদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন—"আহা! উহারা বড়ই দয়ার পাত্র, নিজেদের থাকিতে খাইতে পায় না।" এজন্য তিনি কৃপণদিগকে অধিকতর যত্ন সহকারে খাওয়াইতেন।

দেবী স্বর্ণময়ীর নিকট আপন পর বলিয়া কোনও প্রভেদ ছিল না। গোস্বামী মহাশয় নিজে তাঁহার জননীর সমদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তিনি দাসী-পুত্রকে আমার সহিত তুল্যরূপে ভালবাসিতেন। একখানা থালা, ঘটি এবং গ্লাসও তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।" একদিন একজন কাঠুরিয়ার সঙ্গে মজুরীর পয়সা লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মজুরের

দাবী অপেক্ষা গোস্বামী মহাশয় তাহাকে কিছু কম দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া মজুর বলিল—"দাদা গোঁসাই, আপনার সঙ্গে দর ঠিক হইবে না, আপনি মা গোঁসাইকে ডাকুন।" গোস্বামী মহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিলে, তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন—"গরীব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া তুই কি বড়লোক হবি রে? ইহাদের সহিত গোল করিস্ না। ইহারা যা চায়, তাই দে। ইহাদিগকে বরং কিছু বেশীই দিতে হয়, নতুবা ইহাদের স্ত্রীপুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?" এইরূপ মহীয়সী জননীর গর্ভে বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সন, ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার ঝুলন পূর্ণিমায় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২)

বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন তিনি পিতৃহীন হন। স্বর্ণময়ী দেবী শিষ্যবাড়ী ভ্রমণ করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও বা পিতৃহীন বালক দুইটীকে লইয়া পিত্রালয় শিকারপুরে, কখনও বা শান্তিপুরে বাস করিতেন। এইভাবে দিন চলিত।

অতি শৈশব হইতেই বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হইয়াছিল। তিনি মাতা, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-

গণের অনুকরণে পূজা-অর্চ্চনা, সন্ধ্যা-বন্দনা, ঠাকুর-নমস্কার, তুলসীবৃক্ষে জলদান ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে বড়ই ভালবাসিতেন, এবং আপন মনে নিজের ভাবে ঐ সকল কার্য্যের এমন সুন্দর সুন্দর অনুকরণ করিতেন, যাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

"বালক বিজয়কৃষ্ণ সময়ে সময়ে স্বীয় কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে স্বহস্তে সেবা করিতে অত্যন্ত জেদ করিতেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত শিশু ও অনুপবীতী, এজন্য তাঁহাকে ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিতেন এবং বাল্যবুদ্ধি বশতঃ ইহার জন্য ৺শ্যামসুন্দরকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া, কখনও মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া, কখনও বা স্বপ্ন-যোগে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা ও হাবভাবে প্রকাশ পাইত, যেন স্বয়ং শ্যামসুন্দরের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ ও ভাব-বিনিময় চলিতেছে।

"একদিন কার্ত্তিক মাসে জননী স্বর্ণময়ী ৺শ্যামসুন্দরের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রভাতে গৃহে আসিয়া দেখেন শয্যায় বিজয় নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বিজয় ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করিতেছে; দ্বার মোচন করিতে না পারিয়া

কখনও দ্বার খুলিবার জন্য ৺শ্যামসুন্দরকে কাকুতি মিনতি করিতেছে। এইরূপে সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, প্রভুর শ্রীবিগ্রহকে বিস্মৃত বালক আরক্ত নয়নে শাসাইতেছে—"একটু পরে দুয়ার খুলিলে তোমাকে কে রক্ষা করিবে দেখিব ?" এই বলিয়া দীর্ঘ যষ্টি হস্তে বালক দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারী আসিয়া দ্বার খুলিল। কিন্তু অনুপবীত বালক শ্রীমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। তখন বালক—রাগে কি অনুরাগে কে বলিবে—৺শ্যামসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"আমার ভাঁটা চুরি করিয়া পলাইয়া আসিলে। আর আমাকে ঘরে যাইতে দেওয়া হইল না। আচ্ছা, কাল আবার খেলিতে আসিও ? আমি এর প্রতিশোধ না লইয়া জল গ্রহণ করিব না।" সেদিন আর বালক কিছুই আহার করিতে পারিল না। মধ্যরাত্রে জননী দেখিলেন, প্রেমাবিষ্ট বালক শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্যামসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"যাই আমার কাছে ঘাট মানিলে, তাই বাঁচিলে। নতুবা আজ তোমাকে ভাল করিয়া মজা দেখাইতাম।" আবার বালক বলিতে লাগিল—"আমি যেন ভাই, তোমার উপর রাগ করিয়া খাই নাই। তুমিও কেন আজ খাও নাই ? এখন এস, দুইজনে খাই।" এই বলিয়া বালক আহারে বসিল এবং আহার শেষে পুনরায় শয়ন করিল। এইরূপ অলৌকিক

ঘটনা দেখিতে দেখিতে জননী স্বর্ণময়ী একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় পরে আর ভীত হইতেন না। আশ্চর্য্য যে, পরদিন বালককে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলিতে পারিল না। তবে, সেই রাত্রিতে পূজারি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের মাধ্যাহ্নিক ভোগ হয় নাই।

"বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবনে আরও একটী অতি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বালক অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। তৎকালে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আত্মীয়-স্বজনের অনেক ডাকাডাকির পর যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। পরে যখন সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বালক বলিল—"আজ বাবা আমায় চাঁদের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে তাঁহার কোলে বসাইয়া কত নদী, কত পাহাড়, কত সুন্দর সুন্দর ফুল বাগান দেখাইয়া বলিলেন—'দেখ বাবা, আমার বংশে একজন খুব বড় সাধু, আর একজন খুব বড় বৈষ্ণব হইবে। তুই কি সেই বড় সাধু হইতে পারিবি?' আমি বলিলাম—'হাঁ বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি পারবো।' তারপর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।" *

* বালক বিজয়কৃষ্ণ

বাল্যকাল হইতেই বালক বিজয়কৃষ্ণের সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ অই অতটুকু বয়সেই সন্ন্যাসী সাজিতে ভালবাসিতেন। কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন পরিধান করিতেন। এসময়ে তাঁহার মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটা ছিল, এজন্য সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া 'জটা গোঁসাই' বলিত।

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম বিদ্যারম্ভ তাঁহার মাতুলালয় শিকারপুরের পাঠশালায়; পরে শান্তিপুরে ৺ভগবান সরকার নামক একজন ধার্ম্মিক পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে তিনি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ভগবান সরকার মহাশয় বালক বিজয়কৃষ্ণের সরলতা, সত্যপ্রিয়তা ও তেজস্বিতা দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণও গুরুকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ৺ভগবান সরকার মহাশয়ের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"গুরু মহাশয় একদিন পাঠশালায় ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'ওরে ছেলেরা, কা'ল সকালে আসিস্, এক সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাইব। সেখানে আমি দেহ ত্যাগ করিব।' এসংবাদে শান্তিপুরের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলে গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইলেন। গুরুমহাশয় স্নান করিয়া সকলকে প্রণাম করতঃ গঙ্গাজলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন—'ছেলে সব,

আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি ; এখন বাপু সকল, আমার মাথায় পা দেও, আর সময় নাই, ঐ দেখ আমার রথ আসিতেছে'। ইহা বলিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন ; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দেহ টলিয়া পড়িল না। তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র ছাত্র মিলিয়া, যেমন পিতামাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে হয়, তেমনি তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।" এমন ধার্ম্মিক সাধু মহাপুরুষের নিকট তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইংরেজীতে একটী কথা আছে—বাল্যকাল ভবিষ্যৎ জীবনের দর্পণ-স্বরূপ। যে বালক ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে, বাল্যকালে তাহার চরিত্রানুশীলন করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবকালেই বিজয়কৃষ্ণ পরের দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন কেবল মাত্র ছয় বৎসর, সে সময়ে তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন যে, শান্তিপুরের একজন জমিদার একটী গরীব প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তাহাকে বাঁশ দলন দিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি দ্রুতপদে উক্ত জমিদার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র উন্মত্তের ন্যায় অত্যাচারী জমিদারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি ডাকাত!

ডাকাত ! লোকটি যে ক্লেশে মারা গেল, তোমার লাগ্‌ছে না ? ভাল চাও ত এখনি ইহাকে ছেড়ে দাও।” জমিদার মহাশয় বালকের এইরূপ সাহস ও মহাপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া সেই ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের শৈশবকালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—“দরিদ্রের নিরন্ন কুটীরে, রোগীর শয্যা পার্শ্বে করুণাপূর্ণ হৃদয় লইয়া, তাহাদের অন্ন ও পথ্যদানে সাহায্য করিতেন। দেশে কলেরা,বসন্ত প্রভৃতির সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ সময়ে যখন গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার ও রোগীর আর্ত্তনাদ উঠিত, নিরাশ্রয় নীরব কুটীরদ্বার হইতে যখন আত্মীয় স্বজনগণ জীবনাশঙ্কার নানা আজুহাত ও প্রতিবন্ধকতা দেখাইয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইতেন, তখন বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। সকলের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও দেবশিশুর ন্যায় সেখানে সদলবলে আবির্ভূত হইয়া, পীড়িতের সেবা ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

“জ্যৈষ্ঠের এক নিশীথ রাত্রিতে ছারপোকা ও মশকের উপদ্রবে শয্যায় শয়ন করিতে করিতে কাতরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছি, এমন সময়ে ‘আগুণ আগুণ’ এই ভীষণ কোলাহলে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাঁতিপাড়ায় একখানি চালায় আগুণ

লাগিয়াছে ও বিজয় তাহার দলবল লইয়া সেই প্রবল দাবানল নির্ব্বাপিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সেদিন বিজয় যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই নাই। তাঁহারই চেষ্টাতে সেইরাত্রে অনেক দরিদ্র তন্তুবায়ের কুটীর ব্রহ্মার করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

"আর একবার বর্ষার সময়ে 'বাওয়ের' (জলাশয়ের) বাঁধ কাটিয়া দিয়াছিল, আমার মাতা আর্দ্রবস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—'বাবা! বোনো! বিজয় যে আজ কি করে একটী ছেলেকে ঘড়-ভাঙ্গা স্রোতের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, তুই দেখিয়া নয়ন সার্থক করে আয়! ছেলেটি এখনও পুলের উপরে আছে।' ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম যে স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। বালকটি ধীরে তখন সকলের চেষ্টা ও যত্নে উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতেছে, আর নিমজ্জিত বালকের উন্মাদিনী মাতা তাহার পরিজনবর্গ সহ বিজয়ের নিষেধ সত্ত্বেও তাহার অবশ ও শিথিল হস্তপদাদি টিপিয়া দিতেছে।"

বাল্যজীবনেই যাঁহার চরিত্র এত মহৎ, পবিত্র ও পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল, উত্তরকালে যে তিনি একজন দেশবিখ্যাত মহাপুরুষরূপে পরিচিত হইবেন, সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে?

পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে চতুষ্পাঠিতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া অবশেষে বেদান্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এবিষয়ে আচার্য্য কৃষ্ণগোপাল বলিয়াছেন—"বিজয়ের অদ্ভুত মেধা আমি দেখিয়াছি, সে আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিল। প্রথমে কয়েকদিন সাঙ্খ্য দর্শন দেখিয়া পরে বেদান্ত শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বেদান্ত পরিভাষা ও বেদান্ত দর্শন পড়াইয়াছিলাম। অল্প আয়াসেই বালক শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিতে লাগিল—ব্রহ্মজ্ঞান তাহার ভিতর দেখিতে লাগিলাম। মুখ মানব-হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। হৃদয়ের ভাব মুখেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব ভাব সকল খেলা করিত।"

(৩)

১২৬৬ সনে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় আগমন করিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এসময়ে তাঁহার সহপাঠি ছিল, তাঁহার বাল্যসহচর ৺অঘোরনাথ গুপ্ত। অঘোরনাথ অতিশয় সাধু-প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া "সাধু অঘোরনাথ"

বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ হয়। তাঁহার মাতুলালয় শিকারপুর নিবাসী ৺রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাঁহার বয়স অষ্টাদশবর্ষ ও যোগমায়া দেবীর বয়স ছিল ছয়।

সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। তখন দেশের অবস্থা অতি ভয়ানক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নবীন মোহময় আদর্শ দেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তখন মদ্যপান, যথেচ্ছভোজন ছাত্রগণের নিকট সভ্যতার আদি বলিয়া বিবেচিত হইত। এ সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ নানা প্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া শিক্ষিত যুবকগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতার মোহে শত শত যুবক ধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য নামক গোস্বামী মহাশয়ের দুইজন বন্ধুও এসময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিল। কি করিবেন তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। "এই সময়ে এক দিবস রংপুর জেলার অন্তর্গত আমলাগাছি নামক গ্রামে গোস্বামী প্রভুর জনৈক পিতৃশিষ্য

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার পদ পূজা করিতেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তাহাতে সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমাতে এ সকল ক্ষমতা নাই, আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই; দূর হউক, এরূপ কপটাচরণ করিব না।' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শিষ্যবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণের বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা ছিল। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণও উহাতে আন্দোলিত হইতেছিল। এ সময়ে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধে তিনি একদিন বুধবার সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। তখন বুধবার দিবস সমাজে উপাসনা হইত। সমাজে গিয়া সে স্থানের আলোকমালা, সুমধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র পাঠ ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার চিত্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। সেইদিন

আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "পাপীর দুর্দ্দশা ও ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ নিজকে নিতান্ত নিরাশ্রয় মনে করিয়া তখন মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময় ঈশ্বর, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক বোধ হয় আর পৃথিবীতে কেহ নাই। পূর্ব্বে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতাম, এখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ! প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আমি আর কোথায়ও যাইব না। তোমার দ্বারেই পড়িয়া রহিলাম।" এই ঘটনার অল্প-দিন পরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন মহাশয় বলেন—"এই সময় হইতে গোস্বামী প্রভু, প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করিয়া অপার শান্তি সুখ অনুভব করিতেন। এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে অভিলাষী হইতেন, নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট হইতে তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইতে লাগিলেন। যে দিন যে সত্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন; এবং সেই লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া 'ধর্ম্মশিক্ষা' নামক এক-খানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইতে শান্তিপুর

গমন করেন। একদিন তিনি মনে মনে আলোচনা করিতে- ছিলেন যে, ভগবান্ সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই সকলের মাতা পিতা, সুতরাং প্রত্যেক নরনারীকেই ভাই- ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি প্রকারে? এই প্রকার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একাদশ বর্ষীয় একটী বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল— "যদি তুমি জাতিভেদ না মান, তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন? বালকের কথা ঠিক বোধ হওয়াতে গোস্বামী প্রভু তৎক্ষণাৎ উপবীত ত্যাগ করিলেন। জননী স্বর্ণময়ী এই ব্যাপার অবগত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে, মাতৃহত্যা ভয়ে গোস্বামী প্রভু পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিলেন।" একদিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে গোস্বামী- প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"উপবীত রাখা উচিত কিনা, মৎস্য মাংস আহার করা উচিত কিনা?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন "উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ, আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য- মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না; মশা ছারপোকা যখন মার, তখন অন্য জীবহত্যায় দোষ কি?" এই দুইটী উত্তর শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা প্রতিপালন না করা

মহাপাপ ও কপটতা, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিয়া পুনরায় উপবীত পরিত্যাগ করিলেন।

পরদুঃখে কাতর ধর্ম্মপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া দেশের শত শত নরনারীর কুসংস্কার, ধর্ম্মহীনতা ইত্যাদি দূর করিবার জন্য প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মধুর ভাষা, অপূর্ব্ব শব্দযোজনা, সর্ব্বোপরি ভক্তিরসসিক্ত অপূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণে প্রায় চারি পাঁচ শত লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাজপথে দণ্ডায়মান থাকিত। এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রচার-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের উপবীত পরিত্যাগ ঘটনা লইয়া শান্তিপুরে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধার্ম্মিক ও তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকের পদে ব্রতী হইলেন। তিনি প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিলে, আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে—বিজয়কৃষ্ণ উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াই প্রচারকের চলা কর্ত্তব্য।

এ সময়ে বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মানুরাগ কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে জানা যায়, "একদিন একটী

প্রবল ঝঞ্ঝাবাত কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। রাজপথে বুক সমান জল দাঁড়াইয়াছিল। সেই প্রবল ঝড়ে বহু গৃহ ভগ্ন, অসংখ্য বৃক্ষ উন্মূলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ নদীর স্রোতে পরিণত হইল। অগণ্য মৃতদেহ সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! গোস্বামী মহাশয় ছাদে উঠিয়া প্রকৃতি দেবীর সেই ভীষণ লীলা দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, অদ্য উপাসনার দিন; কিন্তু কাহার সাধ্য যে ঘরের বাহির হয়? উপাসনার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, গোস্বামী প্রভু ততই অস্থির হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার নিকট সমস্ত বাধা বিঘ্ন পরাস্ত হইল। তিনি কোমর বাঁধিয়া গৃহের বাহির হইলেন। হ্যালিডে ষ্ট্রীটের নিকট গিয়া দেখিলেন, গলাজল হইয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সাঁতার জলে পড়িলেন। অবশিষ্ট সমস্ত পথ প্রায় সন্তরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন, ঘর জনশূন্য এবং সমাজগৃহও ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে। তখন মন্দিরের ভৃত্যদ্বারা একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তদুত্তরে লিখিলেন—'আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।' সুতরাং তাঁহাকে একাকী বসিয়াই উপাসনা করিতে

হইল। উপাসনা করিয়া ফিরিবার সময় পথে কেশব বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনিও পাল্‌কিতে চড়িয়া সমাজে গমন করিতেছিলেন। পুনরায় দুইজনে একত্র হইয়া সমাজে আগমনপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।" *

"যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ ;
ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।"

ইহাই ছিল বিজয়কৃষ্ণের মূলমন্ত্র। তিনি দেহ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌' মহামন্ত্র সার করিয়া ধর্ম্মের জন্য—সমাজের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

কত দুঃখ দৈন্য, কত অনাহার নির্য্যাতন যে এসময়ে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। কোনদিন মুড়ি খাইয়া—কোন দিন বা অনাহারে থাকিয়া দিন কাটিয়া যাইত। প্রতিদিনের আহার্য্য সামগ্রী প্রায়ই কিছু সঞ্চিত থাকিত না। অনেক সময় অনাহারে রজনী কাটিয়া যাইত। ভাত জুটিলেও কত সময়ে কেবল নূন ভাতই অমৃতের স্থান অধিকার করিত।

অনেক সময় কাঁটানটে শাকের ব্যঞ্জন হইত। অনেক সময় অন্নের উপকরণ সংগৃহীত না হওয়ায় হলুদ মিশাইয়া খেচরান্ন করা হইত এবং দোপাটি ফুল ভাজিয়া লওয়া হইত।

* আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—৮০ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অবশেষে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পঞ্জাব দেশে উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ চিন্তা করিয়া কখনও কখনও মনে করিতেন যে তাঁহার মত পাপী আর নাই। এ সময়ে মনের এই দুর্ব্বলতা কোনরূপেই দূর করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিয়াছিলেন ঃ—

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে (নাথ) ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ সম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে যে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে' কেশে ধরে' দাও চরণে আশ্রয়।"

এই গান করিয়াও যখন মনের গ্লানি দূর হইল না, তখন তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য গভীর রাত্রিতে রাবী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। জলে ঝাঁপ দিতে যাইবেন,

এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—"ইএ বাচ্চা, শরীর ছোড়নেসে পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধর। তেরা ভালা হোগা। যব্ পাপ ছুটেগা, তু কুচ্ নেহি জানোগে। আভি বহুত রোজ দের হায়। খোদা সব কামকা বখৎ ঠিক্ কর্ রাখা। বাতাস্‌সে ধুর উড়তা, ওভি খোদাকা ইচ্ছাসে হোতা। ঘাবড়াও মৎ। দুনিয়ামে খোদাকা খেল্ দেখ্।" অর্থাৎ বৎস! শরীর নাশে পাপের নাশ হয় না। ধৈর্য্য ধর, তোমার মঙ্গল হইবে। যখন পাপ তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে, তখন তুমি জানিতেও পারিবে না। কিন্তু এখন তাহার অনেক দেরী আছে। ভগবান্ সমস্ত কার্য্যেরই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ুবেগে ধূলিরাশি উত্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ইচ্ছামত হয়। অতএব চিন্তিত হইও না; জগতে জগদীশ্বরের লীলা দর্শন কর।"

পশ্চিমের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া "১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গোস্বামী মহাশয় ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন। তিনি পূর্ব্ব-বাঙ্গালাতে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন। গোস্বামী মহাশয় এখানে আগমন করিয়া কয়েকটি প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাতে অনেক শিক্ষিত লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মে।

ঢাকা হইতে তিনি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে ব্রহ্মধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাহার ফল পূর্ব্ব-বাঙ্গালা বহুকাল ভোগ করিবে।”

(৪)

অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ও আচার্য্যের পদে ব্রতী হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিলেও অবশেষে ধর্ম্মপরায়ণতা, ঈশ্বরানুরাগ ও সংকীর্ণতার বিরোধী ভাব ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডীতে আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নদীতে বাণ ডাকিলে যেমন জলরাশি নদীবক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া চারিদিক ভাসাইয়া নেয়, বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মানুরাগও তেমনি তাঁহাকে বিশ্বজনীন প্রেম ও ভক্তির দ্বারে আকর্ষণ করিয়া লইল। ক্ষুদ্র প্রেম-নদী বিশাল সমুদ্রের জল কেমন করিয়া বক্ষে ধারণ করিবে? যে ধর্ম্মের জন্য, যে সংস্কার দূর করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তবু কি যেন কিসের অভাবে তিনি প্রাণে শান্তি অনুভব করিতেছিলেন না। একদিন একজন সাধু মহাপুরুষ সমাজ গৃহে উপস্থিত ছিলেন; সেদিন বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। উপাসনার পর গোস্বামী

মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসনা কেমন হইল?" উত্তরে সাধু বলিলেন, "বড়ী আচ্ছা! সবতো বেদকা বাণী হায়।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন "উপদেশ দিই বটে, কিন্তু আমার প্রাণের অবস্থা উপদেশের অনুরূপ নহে।" তাঁহার কথা শুনিয়া, সাধু কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোম্ গুরু কিয়া?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"না মহারাজ, আমরা গুরুবাদ মানি না।" সাধু কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ওঃ! এইহি ওয়াস্তে সব্ বিগড়্ গিয়া।"—অর্থাৎ এই জন্যই সমস্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে, সমস্ত সাধন ভজন পণ্ড হইয়া যাইতেছে। সাধুর এই কথায় গোস্বামী প্রভুর হৃদয়ে এক পরিবর্ত্তন দেখা দিল; গুরুবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে মত পোষণ করিতেছিলেন, সে ভাব শিথিল হইয়া পড়িল, এবং গুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সে মুহুর্ত্তেই সাধুর নিকট কহিলেন, "আপনি আমাকে দীক্ষা দিন্।" তিনি বলিলেন—"নেহি। তোমহারা গুরু দোস্রা হায়. বখৎ হোনেসে মিল্ যায়গা। ঘাবড়াও মৎ।" এই সময় হইতেই গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যখন যেখানে যাইতেন, সেখানেই সৎগুরুর অন্বেষণ করিতেন।

এ সময়ে তিনি যে কত বিপদ ও বাধা বিঘ্ন সহ্য করিয়াছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। সে সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। "এক সময়ে ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের কোন একটী

জঙ্গলের মধ্যে গোস্বামী-প্রভু দাবানলে পতিত হইয়া আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে 'আমি ও বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় এক সময়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিছুকাল একত্রে সাধন ভজন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে একদিন হঠাৎ চারিদিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। উত্তাপ আর সহ্য করা যায় না। আমাদের কুটীরেরও প্রায় ২০০ হাত নীচে সমতল ভূমি ছিল। প্রথম দেখি একটী প্রকাণ্ড পাহাড়িয়া সর্প লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। পরে একটী ব্যাঘ্রও ঐরূপ করিল। তৎপর ব্রহ্মচারী মহাশয় 'বম্ বম্' শব্দ উচ্চারণ করতঃ আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া দুই শত হাত নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা একটুও আঘাত পাইলাম না। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত প্রথম দেখা হইলে তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—'আমাকে চিনিতে পারিস্? তোর সঙ্গে আমার চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দেখা হয়েছিল। দাবানলে তোকে কে রক্ষা করেছিল?' তখন আমার সব মনে পড়িল।"

গোস্বামী মহাশয় নিজের গুরুলাভের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন, "একদিন গয়ার সুবিখ্যাত মহাপুরুষ রঘুবর দাস বাবাজী ও আমার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে আশ্রমে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে কয়েকটি রাখাল বালক

আসিয়া সংবাদ দিল যে, পর্ব্বতের উপরে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা তাড়াতাড়ি পর্ব্বতের উপরে গিয়া সত্যই একজন দিব্য রূপলাবণ্য বিশিষ্ট তেজস্বী মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম। দুই একটি কথার পরই তিনি আমাদিগকে স্বস্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপুরুষের আদেশ লঙ্ঘন করিতে নাই, তাই আমরা সেই দিন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পর দিবস রঘুদাস ও ব্রহ্মচারী মহাশয় স্ব স্ব কার্য্যে স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি সুযোগ বুঝিয়া, এবং সাধুরা সাধারণতঃ গাঁজা সেবন করেন জানিয়া, কিছু গাঁজা সঙ্গে লইয়া মহাপুরুষের নিকট একাকী উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। চিত্রপটস্থিত দেবতাদির মস্তকের চতুর্দ্দিকে যেমন একপ্রকার জ্যোতির্গোলক অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই মহাত্মার মস্তকের চতুর্দ্দিকেও সেইরূপ একটী জ্যোতির্গোলকের প্রকাশ দেখিয়া আমি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিকটে বসিতেই, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন, "ওঃ ব্রাহ্ম ধরম্! ব্রাহ্ম ধরম্ হাম্ জান্তা হায়! কলকাত্তামে ব্রাহ্মসমাজ হায়। রাজা রাম-মোহন একঠো বড়া আদমি থা। আগাড়ী ওহি ব্রাহ্ম ধরম্

স্থাপন কিয়া। ও লোগ্ বেলায়েত গিয়া। কেশব বাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকো হাম পছান্তা।” এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল পশ্চিম দেশীয় এই মহাপুরুষের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তিনি যতই ঐ সকল কথা বলিতে লাগিলেন, ততই আমার শরীর অবশ হইতে লাগিল ; অবশেষে আমার নড়িবার চড়িবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য রহিল না। আমি জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাতসারে রোদন করিতে লাগিলাম। তখন পিতা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাপুরুষও সেইরূপ আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া দীক্ষামন্ত্র ও সাধন প্রণালী শিক্ষা দিলেন। (১২৯০ সন, আষাঢ় মাস)। এইরূপ অযাচিত দয়া লাভ করিয়া আমি ভক্তিভরে গুরু-দেবকে প্রণাম কবিলাম। প্রণাম করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাইয়া আমার ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি যোগেশ্বরের কৃপালাভ করিয়াছ। এখন তুমি যে স্থানেই গমন কর না কেন, মহাপুরুষেরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ

করিবেন। তোমার গুরুদেবের জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রয়োজন হইলেই তাঁহার দর্শন পাইবে।”

“এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রামশীলার পাহাড়ে অকস্মাৎ আমার সহিত গুরুদেবের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অসীম স্নেহের সহিত সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, ‘ঘাবড়াও মৎ। ভজন কর্ বখৎমে সব্ মিল্ যায়গা’।”

(৫)

দীক্ষা গ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণ গয়া ও জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে সাধন ভজন করিয়া প্রাণে এক অপূর্ব্ব সরস অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। জ্বালামুখী হইতে গোস্বামী মহাশয় গয়ায় ফিরিয়া আসিয়া আকাশ গঙ্গার আশ্রমে থাকিয়া সাধন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার “গুরুদেব পরমহংসজী সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া সাধন বিষয়ে উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিতেন। একদিন তিনি গোস্বামী-প্রভুকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট-সিদ্ধির সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। পরমহংসজী কখনও বায়ু অপেক্ষা লঘু হইয়া শূন্যে পরিভ্রমণ, কখনও বা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি পর-শরীরে

প্রবেশের ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করাইলেন। পাহাড়ের নীচে, নীচজাতীর কয়েকটি লোক একটী মৃতদেহ সংকারের জন্য আনিয়াছিল। কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য লোকগুলি মৃতদেহটি রাখিয়া স্থানান্তরে গেল; পরমহংসজী স্বীয় স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়া ঐ দেহে প্রবিষ্ট হইলে, উহা সজীব হইয়া উঠিয়া বসিল, আর তাঁহার নিজের দেহ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। স্বীয় গুরুদেবের এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু বিস্মিত হইলেন।"

এইরূপ ভাবে গুরুর কৃপায় নানাবিধ অলৌকিক সাধন-ক্রিয়া দর্শন করিয়া ও স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণ আর দেশে ফিরিয়া আসিবেন না। এই সময়ে এক দিবস তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় চুঁচুড়াস্থ বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"তোমাকে যে নূতন মানুষ দেখিতেছি। তুমি নিশ্চয় কিছু নূতন বস্তু লাভ করিয়াছ। এই দেবদুর্ল্লভ বস্তু কি প্রকারে, কোথায় লাভ করিলে?" গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা প্রাপ্তির ইতিহাস বলিলে, মহর্ষি কহিলেন—"যে অমূল্য বস্তু লাভ করিয়াছ, ইহাদ্বারা তুমি ধন্য হইয়া যাইবে, উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই দেবদুর্ল্লভ বস্তু কদাচ ত্যাগ করিও

না। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজে তোমার স্থান হইবে না। তুমি টিঁকিতে পারিবে না। ব্রাহ্ম-সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয় করিবে, তথাপি এ বস্তু কখনও ছাড়িও না।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী অতি অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যে পরিণত হইল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রাহ্ম-সমাজে এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবে বহু ব্রাহ্মই ব্রাহ্মসমাজের সাধন প্রণালী পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা দেখিলেন যে গোস্বামী মহাশয় গোপনে সাধন প্রদান করেন, তাঁহার নিকট রাধা-কৃষ্ণ ও শ্যামা বিষয়ক গান হয়, তিনি দেব-প্রতিমার নিকট প্রণাম করেন, তাঁহার বাসভবনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয়—এইসকল নানা কারণে ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে প্রচারকের পদত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। বিজয়কৃষ্ণ সন্তুষ্টচিত্তে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলে, কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষগণ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গোস্বামী-প্রভুকে ত্যাগ করিলে পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানে প্রথমে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়

নাই, কিন্তু তাঁহার নামকীর্ত্তন, দেবদেবীর উল্লেখ, গুরুবাদ, পদধূলি গ্রহণ, ইত্যাদি নানা কারণে অবশেষে এখানকার ব্রাহ্মগণও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন। এবিষয়ে বহু পত্র বিনিময় হয়, অবশেষে তিনি তাঁহার প্রিয়তম ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত সর্ব্ববিধ বন্ধন পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি যোগাবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালা দেশে নবীন ধর্ম্মের মধুর বিস্তৃতি দ্বারা দেশকে পুণ্য ও পবিত্র করিতে লাগিলেন। এতদিন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক নিবাসে সপরিবারে বাস করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করায় তাঁহাকে স্থানান্তরে আসিতে হইল।

এই সময়ে তাঁহার সমাধির ভাব পরিলক্ষিত হইত। নাম গান শুনিলেই তিনি সমাধিস্থ হইতেন। ঢাকা নগরী আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল। ঘন ঘন নগর-কীর্ত্তন, মহোৎসব প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র পুণ্যের পবিত্রধারা ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। ঢাকাবাসী ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণ গোস্বামী মহাশয়ের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া, একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

ঢাকার বিখ্যাত ঘূর্ণীবায়ুর কথা বাঙ্গালাদেশে বিখ্যাত। ইংরেজীতে ইহা Tornedo নামে পরিচিত। এই ভীষণ

ঝড়ের সময় গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। ভীষণ রবে প্রলয়ের হুঙ্কারে এই ঘূর্ণীবায়ুতে যখন বহু অট্টালিকা ভগ্ন, অনেক লোকের প্রাণনাশ এবং নদীর বুকে বহু নৌকা ডুবিয়া শত শত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছিল, আকাশের বুকে শত শত আগুণের গোলা ছুটিয়া বেড়াইতে-ছিল, সারা সহর প্রলয়ের কোলে কাঁপিতেছিল. তখন "গোস্বামী-প্রভু ঐ শব্দ শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত গৃহের বহির্ভাগে আগমন করিলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পূর্ব্বক, করযোড়ে নমস্কার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'জয় মা কালী! দয়া কর, প্রসন্ন হও; জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! ঐ সব অগ্নিগোলা আমার বুকে নিক্ষেপ কর'—ইত্যাদি প্রকারে মহাবীর ও মহাকালীর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্তব করিবার পরই ঘূর্ণীবায়ু আকাশে মিলিয়া গেল, উপদ্রবেরও শান্তি হইল। ঝড় থামিয়া গেলে তিনি বলিলেন যে, আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, মহাকালী ও মহাবীর ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া গভীর গর্জ্জনে দিগন্ত কাঁপাইয়া অসংখ্য অগ্নিগোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এবং ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি কালিকাদেবীর সঙ্গিনীগণ সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন, তাহাই লণ্ডভণ্ড করিয়া ভীষণ গতিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। আজ তিনি ঐ ভাবে স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত না করিলে আর

রক্ষা ছিল না। কোন কোন পাপের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা আজ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। *

১২৯৫ সনের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে গেণ্ডেরিয়ার নির্জ্জন প্রান্তে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তিনি বাস করিতে লাগিলেন। আশ্রমের একটী প্রাচীন আম্রবৃক্ষতলে গোস্বামী মহাশয় সাধনের জন্য ১০ হাত দীর্ঘ এবং ৮ হাত প্রশস্ত দক্ষিণদ্বারী একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কুটীরে দুইটী প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহার একটীতে তিনি সাধন ভজন করিতেন, অপরটীতে শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মালোচনা এ সকল হইত। তিনি এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ কুটীরের দেয়ালের বহির্ভাগে একটী নিশান চিত্রিত করিয়া তদুপরি "ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ" এবং কুটীরের ভিতর দেয়ালের গায়ে চাখড়ি দ্বারা নিম্নলিখিত উপদেশ কয়টি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

১। এইসা দিন নেহি রহেগা।

২। আত্মপ্রশংসা করিও না।

৩। পরনিন্দা করিও না।

৪। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনদিগের আচরণের সহিত যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

---

* শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—৩১৭ পৃষ্ঠা।

৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

আর তিনি স্বয়ং করতাল সংযোগে নিম্নলিখিত সঙ্গীত তিনটি গান করিতেন।

১। ললিত—ঠুংরি।

হরি সে লাগি রহরে ভাই।
তোর বনত বনত বনি যাই॥
ওঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুধন কসাই,
শুয়া পড়ায়েকে গণিকা তারে, তারে মিরাবাই।
দৌলত ছুনিয়া, মাল খাজনা, বেনিয়া বয়েল চড়াই,
এক বাত্‌সে ঠাণ্ঠা লাগে, খোঁজ খবর নাহি পাই॥
এইসা ভক্তি, কর ঘট-ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই,
সেবা-বন্দন, আউর দীনতা সহজ মিলয়ে রঘুরাই॥

২। খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর, এইসাহি নাম তুঁহার।
প্রভুজী, এইসাহি নাম তুঁহার॥
পতিত অপবিত্র লিয়ে কর আপনার,
সকল করত নমস্কার।
জাত-বরণকো, পুছত নাহি,
যাচত চরণার বার।
সাধু সঙ্গ, নানক বুধ পাই,
হরিকীর্ত্তন জীউ-আধার॥

৩। খাম্বাজ—একতালা।

(মনরে) সদায় হরি বোল, (মধুর) হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হ'তরে, তবে লালাজী ফকির হত না ॥
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে, তারে যমদূতে ছুঁতে পেল না।
(মধুর হরিনামে রে)
নামে জগাই-মাধাই ত'রে গেলরে! ভবে অপার নামের মহিমা।
(হরিনামের গুণে রে)
নামে রূপ সনাতন ফকির হল রে! (ভবে) কি দিব নামের তুলনা ॥

ঢাকার আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকিবার ব্যবস্থা তাঁহার পক্ষে করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাকে বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থানের লোকেরাই চাহিতেছে, সেই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার পক্ষে কি একস্থানে অবস্থান করা সম্ভবপর? ঢাকা হইতে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কখনও তীর্থ পর্য্যটন, কখনও সাধু মহাত্মার দর্শন, কখনও কুম্ভমেলায় গমন, এইভাবে বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ১৩০৪ সনের ২৪শে ফাল্গুন পুরীধামে যাত্রা করেন, এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন, সে কথা পরে বলিব।

বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মের জন্য—সাধনার জন্য ও ঈশ্বর লাভের জন্য যে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, সে সকল কথা স্মরণ করিলেও হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের ও ভক্তির উদয় হয়।

তিনি যখন যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তখনই সে স্থানের সাধুমণ্ডলী তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রেমাবতার মহাসাধকপুরুষ রূপে সাদরে কিরূপ অভিনন্দিত ও অর্চ্চনা করিয়াছেন, এক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

এখানে তাঁহার কৈলাসপুরী দর্শনের কথা বলিতেছি। তিনি সেই অদ্ভুত ঘটনাটি নিজে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"এক সময়ে আমি কয়েকজন সাধুর সঙ্গে হিমালয় পার হইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে পথে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই পথে চলিতে থাকি। বরফের উপর দিয়া অনেক কষ্টে চলিতে লাগিলাম। সরু রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে একস্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম। সেই স্থানে একটী কুণ্ড দেখিলাম। মহাদেব কুণ্ড ও মহাদেবের পূজা করিতে হয়। আমরা যেমন পূজা করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলাম, অমনি কোথা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হনুমান আসিয়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। পরে, কুণ্ড হইতে এক রথ উঠিল। তার মধ্যে মহাদেব দর্শন করিলাম। পরে সেই হনুমানদিগকে যথাসাধ্য ফলাদি খাইতে দেওয়া হইল। তাহারা খাইয়া চলিয়া গেল। অমনি রথসহ মহাদেব সেই কুণ্ডে অন্তর্হিত হইলেন। কিংবদন্তী এই যে, এই দিবস এই রথ দর্শন করিতে না পারিলে, কৈলাসপুরী গমন অথবা জগতের আদি দর্শন করিতে পারা যায় না।"

এই স্থানের পর হইতেই চিরতুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। হঠযোগের প্রক্রিয়া বিশেষ অভ্যস্ত না থাকিলে, সেই স্থানের ভীষণ শীত সহ্য করা যায় না। অনেকে এই পথে শীতের দারুণ প্রকোপে প্রাণ হারাইয়াছেন। এই সকল বরফাবৃত স্থানে মৃতদেহ পচিয়া যায় না। শরীরের রক্ত মাংস প্রথমতঃ জমাট বাঁধিয়া সমগ্র শরীরটি বরফে পরিণত হয়, এবং এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিলে, বিশ্বনিয়ন্তার কি এক আশ্চর্য্য কৌশলে, অবশেষে বরফ হইতে প্রস্তরে পরিণত হয়। মহাপ্রস্থানের সময় মহামতি যুধিষ্ঠির এই বিষয় অবগত হইয়া, পরবর্ত্তী যাত্রীদিগকে সতর্ক করিবার জন্য একখানি প্রস্তর খণ্ডে "অত্র অগ্রে ন গচ্ছন্তি"—একয়েকটি কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাও দর্শন করিলেন।"

"গোস্বামী প্রভুর শরীর অপটু ছিল, তাহাতে আবার তিনি হঠযোগের ক্রিয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার সঙ্গী সাধু দুইজন হঠযোগে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বরফময় প্রদেশের উপর দিয়া কৈলাশপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পথে উক্ত মহাপুরুষদ্বয় অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। শাস্ত্রে তপোবনের যেরূপ বর্ণনা আছে, কৈলাস পর্ব্বতের এই সকল নিভৃত স্থানে তাদৃশ অনেক তপোবন

তাঁহারা দর্শন করিতে লাগিলেন। নরমাংসভোজী অনেক অসভ্য জাতিও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। এই প্রকার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার পর শিবরাত্রির দিবস তাঁহারা অবিকল শিবলিঙ্গের আকার বিশিষ্ট একটী পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া, তদুপরি একটা স্বর্ণময়ী পুরী দর্শন করিলেন। এই পর্ব্বতের গাত্রস্থিত একটী প্রকাণ্ড গোঁফার মধ্যে তাঁহারা বহু প্রাচীন ঋষি মুনিদের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুইজন সঙ্গীর মধ্যে একজন ছিলেন গোরক্ষপুরের সুবিখ্যাত সিদ্ধ মহাপুরুষ গম্ভীরনাথজী। তিনি বলিয়াছিলেন, "কিছুদিন গমন করিয়া পথের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত পাইলাম, আর পথ নাই। সেই পথ ঐ স্থানে শেষ। সম্মুখে পাহাড়ের নিকট গিয়া দেখিলাম যে এক প্রকাণ্ড পাথরের দরজা। দুইদিকে দুই ঘণ্টা রহিয়াছে। ভিতরে যতদূর দেখা যায়, দেখিবে অসংখ্য তপস্বী। কেহ দীর্ঘকায়, কেহ শীর্ণকায়। কাহারও কেশসমূহ শুভ্র, কাহারও দীর্ঘ শ্মশ্রু। শরীরের রং কাহারও কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও শ্বেতবর্ণ। কেহ হোম করিতেছেন, কেহ যোগ করিতেছেন, কেহ ভজন সঙ্গীত গাইতেছেন, ইত্যাদি। সেই দ্বার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেব, এই কোন্ ধাম?" তিনি বলিলেন "হরগৌরী ধাম। অদূরে ঐ মন্দির দেখিতেছ, ঐ স্থানে হরগৌরী বিরাজ করিতেছেন। ইহাই কৈলাসপুরী।

সন্ধ্যার সময় পুরীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। মহাপুরুষগণ অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। অতঃপর একস্থানে গোস্বামি-বন্ধুকে দেখিয়া তদীয় সহযাত্রী বিস্মিত হইলেন। "কি উপায়ে তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বেই কৈলাস-পুরীতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন।" এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি শারীরিক অপটুতা-প্রযুক্ত অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় দয়ার সাগর ভগবান্ আশুতোষ দয়া করিয়া তাঁহাকে সূক্ষ্ম শরীরে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্থূল শরীর পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থিত একটী মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। অনন্তর মহাপুরুষগণ দেখিতে পাইলেন, একটী মন্দিরের মধ্যস্থলে একখানি বিচিত্র হিরণ্ময় সিংহাসনে যোগেশ্বর মহাদেব, যোগমায়া পার্ব্বতী দেবীকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন। জগতের আদি পিতা-মাতাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মহাপুরুষগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে নানাপ্রকার স্তব পাঠ করিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শিবরাত্রি অতীত হইয়া গেল। প্রত্যূষে ভগবান্ মহাদেব ও ভগবতী পার্ব্বতী দেবী মহাপুরুষদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক, গোস্বামী প্রভুকে পুনরায় পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত স্বীয় স্থূলদেহে

প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া অপ্রাকৃত কৈলাস ধামে গমন করিলেন।”

(৬)

গোস্বামী মহাশয় পুরীধামে আগমন করিয়া প্রথমতঃ সমুদয় দর্শনীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। “এই স্থানে সুস্থ শরীরে থাকিতে হইলে প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে তৈল মাখিয়া স্নান করা উচিত, পুরাতন তেঁতুল সহযোগে কিঞ্চিৎ পাকালপ্রসাদ ভোজন করা উচিত, এবং প্রখর রৌদ্রের সময়ে ভ্রমণ বন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন।”

গোস্বামী মহাশয় যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন, সেখানেই তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহই পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, ধর্ম্মালোচনা, অতিথিসেবা, ভিক্ষারীদিগকে ভিক্ষাদান, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিকে তাহাদের আহার্য্য ও বৃক্ষলতাদিগকে অতি সুন্দররূপে জলদান ইত্যাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেন। একদিনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

পুরীধামে আসিয়া তিনি যে কয়টি কার্য্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

(১) এ সময়ে পুরীতে বানর বধ করিবার জন্য তথাকার

মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিরোধ। (২) ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন পায়খানার উচ্ছেদ সাধন। (৩) দান যজ্ঞ।

পুরীধামে বানরের অত্যধিক উৎপাত হওয়ায় স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করেন। পুরীবাসীর এইরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহারে, গোস্বামী-প্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি অনেক সময়ে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন এবং একদিন ইহার প্রতিবিধান কল্পে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানস্থিত ৺মহাবীরের মন্দিরে যথাসাধ্য ভোগ মানস করিয়াছিলেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মর্কটদিগের প্রতি গোস্বামী-প্রভু ও তদীয় শিষ্যবর্গের সহানুভূতির বিষয়, জানি না কি প্রভাবে অবগত হইয়া, তাহারা দলে দলে গোস্বামী-প্রভুর বাসভবনে আগমন করতঃ বিবিধ প্রকার হাবভাব দ্বারা তাহাদের ঘোর বিপদের কথা প্রকাশ করিত; এবং একদিবস বড়দণ্ড নামক রাস্তায় জনৈক শীকারীকে দেখিয়া একটি বানর দৌড়িয়া আসিয়া গোস্বামী-প্রভুর একজন শিষ্যের পদধারণ পূর্ব্বক ইঙ্গিত দ্বারা তাহার আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল। অতঃপর শীকারীর সন্ধান পাইলেই বানরগণ সন্তান সন্ততিসহ গোস্বামী-প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইত এবং তিনিও তাহাদিগকে অতিশয় আদরের সহিত আম্র, কলা

ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্য সকল খাইতে দিতেন। বানরগণও নির্ভয়চিত্তে তাঁহার আসনের নিকটে বসিয়া আহার করিত।

অতঃপর গোস্বামী প্রভুর আদেশে শিষ্যগণ বানরবধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুক্তির সহায়তায় প্রকাশ্য পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিতে থাকিলে. তদানীন্তন সহৃদয় ছোটলাট সারজন্ উড্‌বরণ সাহেব বানরবধ রহিত করিয়া দেন। বানরবধের অবৈধতা ও অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ক ব্যবস্থা পত্রে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কটক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পূজ্যপাদ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গ, উৎকল ও বারাণসী-বাসী প্রায় ৫০।৬০ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মর্কটবধ বন্ধ হইলে, গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্বোক্ত ৺মহাবীর ঠাকুরকে যোড়-শোপচারে পূজা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় মিউনিসিপালিটি, মন্দিরের সেবকদিগের সুবিধার জন্য মন্দিরের প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন একটি পায়খানা প্রস্তুত করেন। ইহাতে গোস্বামী-প্রভু আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, শাস্ত্রমতে প্রাচীরাদি সমন্বিত

সমগ্র মন্দিরটাই ভগবানের দেহস্বরূপ এবং তন্মধ্যস্থিত বিগ্রহ ঐ দেহের আত্মস্বরূপ ; সুতরাং শাস্ত্রমতে কিছুতেই মন্দিরের গাত্রে পায়খানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। অতঃপর তদীয় শিষ্যবর্গ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলে, পূর্ব্বোক্ত মহামতি উড্‌বরণ সাহেবের আদেশে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ পায়খানা ভগ্ন করিয়া ফেলেন।

গোস্বামী-প্রভুর তৃতীয় কার্য্য দান-যজ্ঞ। তিনি পুরীতে পদার্পণ করিয়াই যে দান সত্র খুলিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া একটি বিরাট দানসাগরে পরিণত হইয়াছিল। এই দান ব্যাপারে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, জাতিবর্ণ বিচার ছিল না, সাধু অসাধু বিচার ছিল না ; যিনি যে অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহার তাহাই মোচন করা হইয়াছে। কেহ আসিয়া বলিলেন, অর্থাভাবে তাঁহার পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইতেছে না, দাও উহাকে ১০৲ টাকা ; কেহ বলিলেন, তাঁহার ঘর মেরামত করিতে পারিতেছে না, দাও উহাকে ২০৲ টাকা ; কেহ বলিলেন, তাঁহার দেশে যাইবার রেলভাড়া জুটিতেছে না ; দাও যাহা প্রয়োজন। ভাণ্ডারে একটি পয়সা থাকিতেও দিবানিশি এই ভাবেই দান কার্য্য চলিয়াছিল। টাকার অভাব হইলে ঋণ করিয়াও দান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইমার মঠে দুই হাজার ব্রাহ্মণকে

বস্ত্রদান, বড় আখ্‌ড়ায় চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ৫ হাজার সাধুদিগকে ভোজন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া লোটা ও ৮ হস্ত পরিমিত বস্ত্র দান, বড়দণ্ডের প্রায় এক হাজার কাঙ্গালীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারা ভোজন এবং বহু পূজারী পাণ্ডাকে গরদের বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান, গোস্বামী-প্রভুর দান-যজ্ঞের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বড় আখ্‌ড়ার চারি সম্প্রদায়ের সাধু সেবার দিবস জনৈক প্রসাদ বহনকারী মুটে এক আটিকা (ভাড়) কাণিকা (মিষ্ট পলান্ন) প্রসাদ অপহরণ করিয়াছিল। ঘটনাটি গোস্বামী-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে, তিনি লোকটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন যে গোস্বামী-প্রভু ঐ ব্যক্তিকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিবেন, অন্ততঃ পক্ষে তীব্র ভর্ৎসনা করিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে আরও চারি আটিকা প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্যই আনা হইয়াছে। তোমরাও উহা আহার করিবার জন্যই লইয়াছ, এক আটিকায় কি হইবে? আরও চারি আটিকা লও, এবং ঘরে গিয়া দশ জনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাও।" সাধু সেবার জন্য আনীত দ্রব্যের অপহরণকারীর প্রতি গোস্বামী-প্রভুর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া উপস্থিত সকলে একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

তাঁহার এই অপূর্ব্ব দান ব্যাপারে তিন মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

পুরীতে আসিবার পর হইতে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি, ক্ষমতা ও শিষ্য-সংখ্যা ও প্রভাব দেখিতে পাইয়া একদল লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানারূপে তাহারা তাঁহার শত্রুতা করিত। গোস্বামী মহাশয় জগন্নাথ ধামে মহাপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না এবং কেহ মহাপ্রসাদ বলিয়া কিছু প্রদান করিলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তাঁহার মহাপ্রসাদের প্রতি এইরূপ অসাধারণ শ্রদ্ধা জানিয়া একবার একজন সাধু-বেশধারী খল প্রকৃতির লোক তীব্র বিষ মিশ্রিত একটী লাড্ডু তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহা প্রাপ্তি-মাত্র ভোজনের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল। সে দিন কোন সেবকই সে স্থানে উপস্থিত ছিল না। তিনি প্রসাদের ন্যায় মহাপ্রসাদরূপে সেই লাড্ডু ভক্ষণ করিলেন। তীব্র হলাহলের ক্রিয়া তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইল, তিনি ক্ষণকালের মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ মহাদেব লোকনাথ প্রভুর কৃপাতে অত্যল্পকালের মধ্যে পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। বিষের শক্তি হ্রাস পাইল, যেন কিছুই হয় নাই তেমনি ভাবে পুনরায় পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য চলিতে লাগিল।

শিষ্যগণ তাঁহার এইরূপ আকস্মিক পীড়ার বিষয়

অবগত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন "ইহা এক বিষম ষড়যন্ত্রের ফল। প্রায় পঁচিশ জন ব্যক্তি ইহাতে সংশ্লিষ্ট। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব আমাকে ঐ সকল লোক দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের পুরী আগমনের পর ঐ সকল লোকের প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া ইহারা এইরূপ অমানুষিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।"

কোন কোন স্থানীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এ বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। তিনি সমস্ত দেখিয়াছেন, ইচ্ছা হইলে তিনিই প্রতিবিধান করিবেন, নতুবা লোকের নিকটে আমি কোনরূপ প্রতিকারের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব না।"

তাঁহার শিষ্যগণ এইরূপ শত্রু-পরিবেষ্টিত ভাবে না থাকিয়া কলিকাতা যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোরা এত ভাব্ছিস্ কেন? স্বয়ং জগন্নাথ দেব তিনবার আমার খবর নিচ্ছেন। ইনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, আমার ভয় কি? অন্যস্থানে গেলে কি ত্রাণ পাইব? একটা কাঁটা ফুটিলেও তো মৃত্যু হইতে পারে। আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে ধরিয়া আছড়াইলেও কিছু হইবার জো নাই। অন্যদিকে তোমরা তাকাও কেন? যাইবার ইচ্ছা হইলে তোমরা চলিয়া যাও। আমি কেবল

মাত্র লাঠিগাছা অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাহার ইচ্ছা ভিন্ন কদাচ কিছু করিব না। এখানে আমি যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে আমার আর কোন কর্ম্ম নাই। এখন আদেশ হইলেই যাইতে পারি। কিন্তু এক কপর্দ্দক ঋণ থাকিতেও নড়িব না। এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ শীঘ্র শীঘ্র ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উঠিতে, বসিতে, হাঁটিতে চলিতে, সর্ব্বদা তাঁহাকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত; তথাপি একটি দিনের জন্যও, তাঁহার পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। গোস্বামী-প্রভু শেষ-জীবনে বহু বৎসর পর্য্যন্ত একেবারই নিদ্রা যান নাই, সমস্ত রাত্রি আসনে বসিয়া ভগবৎধ্যানে অতিবাহিত করিতেন, কখনও বা জাগ্রত শিষ্যগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। বর্ত্তমানে ঈদৃশ ভগ্ন শরীর লইয়াও তিনি এই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার স্নেহশীলা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী একদিন বলিলেন, "তুমি এখন কিছুদিন শয়ন করিলেও ত পার।" তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "আমি যে দিন শয়ন করিব, সে দিন আর থাকিব না, যে দিন আসন ত্যাগ করিব সেদিন আমি থাকিব না।" শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

একদিবস তিনি কয়েক জন শিষ্যের নিকট বলিলেন—“দেখ, তোমাদের সম্মুখে বর্ষাকাল উপস্থিত।” আর একদিবস বলিলেন “দেখ, মাতাঠাকুরাণীর কথাই বুঝি বা সত্য হয়।” (তাঁহার মাতৃদেবী কোন সময় শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “বিজয় পুরী গেলে আর ফিরিবে না।”) আর এক দিবস তিনি ধ্যানাবস্থায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন “অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম” “গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।” একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এ কথা বলিলেন কেন?” তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন “আমার অন্তর্জ্জলী হইল, দেবতারা আমার অন্তর্জ্জলী করিলেন।” এই সময়ে তিনি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গান কয়টী শুনিতে ভালবাসিতেন।

বাহার মিশ্র—তেওট্।

লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন্ গুণে।
ও কেউ চন্দনদানে বস্‌লো রাজ-সিংহাসনে,
আমরা প্রাণদানেও স্থান পেলেম না চরণে।
ছিল প্রবীণে, হলো নবীনে, হায়গো সে যে তোমা বিনে,
যেমন শ্রীরাম বিনে জানকী অসুখী অশোক বনে।
হ’ল রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী
হরি সকলই তোমারই কৃপায়;
তুমি যারে না রাখ পায়, তার বিপদ ঘটে পায় পায়,

(আর) তুমি যারে রাখ পায় সে সকলই পায়,
লজ্জা পায় হে হরি, তোমার পায় ধরা দিন প'লে মনে ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না।
দিন যাবে সুখে না হয় দুঃখে, রবে কেবল ঘোষণা ॥
(লোকে বলে) তুমি দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় প্রেমসিন্ধু,
ওহে করুণার সিন্ধু একবিন্দু দানে শুকাবে না ॥
তুমি বাম করে ধরলে শৈল, সে ভারত তোমার সৈ'ল,
(এই) ত্রিজগতের ভার সৈ'ল (বুঝি) অধমের ভার
সৈ'ল না ॥

এক দিবস গোস্বামী-প্রভু শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আজ হইতে স্বয়ং জগন্নাথদেব তোমাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, আমার কথা বিশ্বাস কর, নিশ্চয়ই তোমাদের শান্তি আসিবে, কিন্তু সময় সাপেক্ষ।" এই কথা বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই যে! এখানে জগন্নাথদেব উপস্থিত! এসব কথা আমি বলিতেছি না, তিনিই আমার মুখ দিয়া বলাইতেছেন।" ইহাই তাঁহার শিষ্যদের প্রতি শেষ উপদেশ বাণী। ১৩০৬ সনের ২১ জ্যৈষ্ঠ তারিখ তাঁহার সমুদায় ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। ঋণ শোধ হইলে শিষ্যগণ তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাইবার

উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এদিকে যে তিনি লীলাবসান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে কথা শিষ্যেরা কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

২২শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, স্বীয় আসনে গিয়া উপবেশন করিতে সমর্থ হইলেন না। একেবারে শয়ন করিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সমাধিস্থ হইলেন। শিষ্যদের মুখে বিপদের চিহ্ন দেখা দিল। পরদিন চক্ষু উন্মীলন করিয়া উচ্চৈঃস্বর তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ আমার শরীর বড় খারাপ, তুমি নিকটে থাকিও।" আসনে গিয়া আর উপবেশন করিলেন না।

পূর্ব্বে এক দিবস তিনি স্বীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট "যেদিন আসন ছাড়িব, সেদিন আর আমি থাকিব না" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ তাহা কাহারও স্মৃতিপথে উদিত হইল না। সে যাহা হউক, সমস্ত দিন পরে গোস্বামী-প্রভুকে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া শিষ্যদিগের মনে আশার সঞ্চার হইল। শ্রদ্ধেয় জগদ্বন্ধু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এখন কি অসুখ বোধ হইতেছে?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"দুর্ব্বলতা ভিন্ন আমার আর কোন অসুখ নাই।" এই সময়ে তিনি কিছু ছানা ও ডাবের জল পান করিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় কিশোরী লাল সেন মহাশয় (অবসর প্রাপ্ত সবরডিনেট জজ্) তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া গোস্বামী প্রভুকে পান করাইতে, অনেকদিন হইতেই তাঁহার অন্তরে একটি বাসনা ছিল। তিনি গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার চা পান করিবার অভ্যাস। সমস্তদিন চা খান নাই, কিছু চা খাইবেন কি?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন "আচ্ছা, ভাল করে, খুব ঘন করে প্রস্তুত করে নিয়ে এস।" এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধেয় কিশোরী বাবু তাড়াতাড়ি চা প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত সরল নাথ গুহ মহাশয় চায়ের পাত্রটী সম্মুখে ধরিয়া রাখিলেন এবং গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে ছোট একটি পাথরের বাটিতে করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে চা পান করিতে করিতে গোস্বামী-প্রভু ক্ষণকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ মস্তক নত করিয়া কাঁহাকে যেন প্রণাম করিলেন, এবং তন্মুহূর্ত্তে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভগ্নদেহের সঙ্গে তাঁহার অমর আত্মার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। (১৩০৬ সন, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার সায়াহ্ন, ৯ ঘটিকা ২০ মিনিট, কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথি।)"

গোস্বামী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইল। অতি অল্প সময়ের

মধ্যে নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরের বিস্তীর্ণ স্থানটি ক্রয় করিয়া মহাসমারোহে শিষ্যগণ কীর্ত্তন করিয়া সমাধিস্থ করিলেন। একদিন বিজয়কৃষ্ণ সরোবরের অপর পারে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"ওপারে স্বর্ণমণ্ডিত একটী মন্দির চূড়া দৃষ্ট হইতেছে।" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে ; এখন সেখানে একটী মনোহর সমাধি মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই মহাপ্রাণ মহাসাধক একদিকে যেমন প্রেম-রাজ্য সংস্থাপক ছিলেন, তেমনি তিনি এই দেশকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। একবার কোন দেশপ্রাণ ব্যক্তি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—আমি দেখিয়াছি মহাতপা সাধকগণ ভারতের কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।„

গোস্বামী মহাশয়ের কীর্ত্তনের সহিত নৃত্য ছিল এক অপূর্ব্ব জিনিষ। সে নৃত্য যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে ৺পুরীধামে কীর্ত্তন হইতেছিল, সে কীর্ত্তনে গায়ক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয়, তিনি গাহিতেছিলেন,—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর,
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে,
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,
কবে হাম রহব সো বৃন্দাবন।
রূপ রঘুনাথ বলি হইব আকুতি,
আর কবে বুঝব যুগল পীরিতি।
রূপ রঘুনাথ পদে রহে মোর আশ,
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।

গোঁসাই প্রভু এই গান শুনিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার বহির্ব্বসনের এক টুক্‌রা রেবতীমোহনকে দান করিলেন, এবং আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জগন্নাথদেব আমাকে বলিতেছেন, এই কীর্ত্তন-গায়ককে একখানা লুই কিনিয়া দাও।" ভক্ত সরলনাথ তন্মুহূর্ত্তে গোঁসাইর আদেশ প্রতি-পালন করিলেন।

ভারতবর্ষের যে স্থানে যখন তিনি গমন করিয়াছেন, তখনই সেস্থানে মহাপুরুষগণ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। 'ইনি আমার প্রাণ;' কেহ বলিতেন—"সাক্ষাৎ মহাদেব",কেহ বলিতেন—"সাক্ষাৎ বিষ্ণু"—এমনি ভাবে তাঁহাকে সকলে আরতি করিতেন। এমন বিনয়ের অবতার, দয়ার অবতার,

সর্ব্বজীবে সমভাব—অতি অল্প মহাপুরুষের মধ্যেই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব কান্তি ও ধ্যানপ্রভা মণ্ডিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী যিনি জীবনে কখনও দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার শিষ্যগণের সহিত সমস্বরে বলিতে বাধ্য হইবেন—

পরজ মিশ্র—ঝাঁপতাল।

অপরূপ শ্রীগুরুরূপ, হৃদয়ে সদা ভাবনারে।
ভবন বন সমান হ'বে শমন-ভয় আর রবে না রে ॥
তরুণ রবি-কিরণ দুটী চরণ পাশে পরকাশে,
ধন্য সে জন ও চরণ (যা'র) হৃদি-সরসে সদা ভাসে,
কোটী জন্মের পাপ নাশে, ও রাঙ্গা পদ-পরশে,
মজ ও পদে মন ভৃঙ্গ অনুসঙ্গ ছাড় না রে ॥
কটিতে ঝাপি কৌ'পীন বহির্ব্বসন শোভে সুন্দর,
দণ্ড কমণ্ডলু করে শোভে কিবা মনোহর,
(জিনি) মদমত্ত কুঞ্জর গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস, মধুর ভাষ, মধুমাখা সব ব্যবহারে ॥
সুবিশাল বক্ষে শোভে সপ্ত-লহরী-মাল,
ঊর্দ্ধ তিলক-রেখা ভালে কিবা শোভে ভাল,
মৌলী-রচিত চূড়া—যেন শ্যামের মোহন চূড়া,
কিম্বা ফণি-ফণা যেন ধরে গঙ্গাধর-শিরে ॥

পৃষ্ঠে দোলে বেণী—যেন ভানু রাজনন্দিনী,
প্রেমনীরে ভাসে সদা শ্রীমুখ কমলখানি,
আনন্দময় সব, আনন্দ-রস-খনি,
মগন দিবা-রজনী কিবা আনন্দ-সায়রে ॥

গোঁসাই প্রভুর ইহাই কীর্ত্তনে শেষ নৃত্য।

সমাপ্ত